খেলা যখন দুই মলাটে

স্বরূপ গোস্বামী

খেলা যখন দুই মলাটে

স্বরূপ গোস্বামী

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

যোগাযোগ
বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন
কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক,
কলকাতা ১০৬
bengaltimes.in@gmail.com

উৎসর্গ

তিনি দেখিয়ে দিলেন, সিনিয়র সিটিজেন হওয়ার পরেও নতুন করে জীবন শুরু করা যায়।

চার দিকপাল ফুটবলারের আত্মজীবনী অনুলিখন করে ময়দানের নানা অজানা ঘটনা যিনি পরম যত্নে তুলে আনলেন, খেলার বইয়ে নতুন করে জোয়ার আনলেন, সেই **সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে**।

সবিনয় নিবেদন

খেলার বইয়ের নাকি পাঠক নেই। এমন একটা আক্ষেপ মাঝে মাঝেই শোনা যেত। কিন্তু গত কয়েক বছরে ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন বইমেলা এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে খেলার বই। কোনওটা হয়তো জীবনীনির্ভর। কোনওটা আবার বিশেষ কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দুই প্রধানকে নিয়েই প্রতি বছরই বেশ কয়েকটা বই প্রকাশিত হয়। আবার খেলার মাঠের নানা মুখরোচক ঘটনা নিয়েও বই লেখা হচ্ছে বিস্তর।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দীপ প্রকাশনের কথা। প্রায় আড়াই দশক ধরে নিয়ম করে তারা খেলার বই প্রকাশ করছে। বলা যায়, বাঙালির ড্রয়িংরুমে খেলার বইকে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। গত এক দশকে তার বিস্তার যেন আরও বেশি। এর বড় একটা কারণ সোশ্যাল মিডিয়া। কোন বই বেরোচ্ছে, কে লিখছেন, বইয়ের বিষয়বস্তু কী, এখন দূরদূরান্তের পাঠকও দিব্যি জেনে যাচ্ছেন। বইয়ের বিপণন ব্যবস্থাও অনেক সহজ হয়েছে। ভিনরাজ্যের কোনও শহর থেকেও অনায়াসেই অনলাইনে অর্ডার করছেন। বই পৌঁছে যাচ্ছে নির্ভুল ঠিকানায়।

আসলে, বাঙালি ছোট থেকেই খেলার অনুরাগী। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মেরুকরণ তো আছেই। ক্রিকেটকে ঘিরেও এই অনুরাগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। যাঁদের বেড়ে ওঠা আটের দশকে, তাঁদের কেউ গাভাসকারের অনুরাগী, কেউ কপিলদেবের। নয়ের দশক মানেই শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি। তাঁদের নিয়েও লেখা হল নানা রকমের বই। বইমেলায় সেসব বই বিক্রি হত ঠিকই, কিন্তু সারা বছর ধরে এইসব বইকে ঘিরে সেই উন্মাদনাটা হয়তো ছিল না। বিশেষ করে যাঁরা জেলায় থাকেন, যাঁরা কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে থাকেন, তাঁদের কাছে এইসব বই অধরাই থেকে যেত।

আমাদের অনেকেরই ছোটবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ময়দানের নানা চরিত্র। নানা ব্যস্ততায় সেই স্মৃতির অ্যালবামে কিছুটা ধুলো জমে। এইসব বই যেন সেই ধুলো ঝেড়ে আবার ফিরিয়ে দেয় হারানো কৈশোর। যতই হাতের স্মার্টফোন থাকুক, বইয়ের খিদে শুধু বই-ই মেটাতে পারে। একটা সুন্দর বই শেষ করার যে রোমাঞ্চ, তার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা হয় না।

তেমনই কিছু বই নিয়ে আলোকপাত। অন্য ধরনের বই নয়, আপাতত শুধুই খেলার বই। দেবাশিস দত্ত, গৌতম ভট্টাচার্যর মতো দিকপাল সাংবাদিকদের লেখা বই যেমন আছে, তেমনই দিকপাল ফুটবলারদের

আত্মজীবনী সুন্দর অনুলিখনে অন্য মাত্রা এনেছেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। দুই দশক ধরে ময়দানের গন্ধ গায়ে মেখে দুই প্রধানকে নিয়ে বই লিখেছেন অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই কিছু বইকে নিয়ে লেখার সংকলন। মূলত গত তিন-চার বছরের বই নিয়েই আলোচনা। 'আজকাল' এর রবিবাসরীয়তে বুক রিভিউ আকারে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত। সেখানে শব্দের সীমারেখা থাকে। ফলে, সবসময় বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়নি। চাইলে এই সংকলনে হয়তো শব্দ বাড়ানো যেত। কিন্তু সেই লেখাগুলি অবিকল একই রাখা হয়েছে। নানা সময়ে বেঙ্গল টাইমসের ই-ম্যাগাজিনেও কিছু রিভিউ জায়গা পেয়েছে। সেখান থেকেও

কয়েকটি সংকলিত। চাইলে এই সংকলনে আরও অনেক লেখাই রাখা যেত। কিন্তু এটা আপাতত প্রথম খণ্ড। পরের খণ্ডগুলিতে আরও অনেক লেখা রাখা যেতেই পারে। যেমন, এই বছর বইমেলায় আরও একঝাঁক খেলার বই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। সেইসব বই নিয়েও আলাদা সংকলন করার ইচ্ছে রয়েছে।

স্বরূপ গোস্বামী
জানুয়ারি, ২০২৬

মহাকালের কাছে সমকালের উপহার

‘সে আসবে, কিন্তু কখন আসবে ঠিক নেই, কেয়ারটেকার যেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখে।’ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে এমনই একটি কবিতা লিখেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

কিছুটা সেই সূত্র ধরেই বলা যায়, তিনি আসবেন, কখন আসবেন, কোনও ঠিক নেই। প্রেসবক্সে পাশের চেয়ারটা যেন খালি থাকে। কিন্তু কেই বা আসবেন! পাশের চেয়ারটা কেই বা খালি রাখবেন?

আসবেন সুনীল গাভাসকার। ধারাভাষ্যের

ব্যস্ততার মাঝেই একবার না একবার ঠিক ঢুঁ মেরে যাবেন প্রেসবক্সে। এসে বসবেন ঠিক দেবাশিস দত্তর পাশের চেয়ারে। সেই কারণেই পাশের চেয়ারটা ফাঁকাই থাকে। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক, এটাই পরিচিত ছবি। বলা যায়, প্রেস বক্সের ওপেন সিক্রেট।

খেলা ছাড়ার পরেও বিশ্বের নানা প্রান্তে ধারাভাষ্যের জন্য ছুটে বেড়াতে হয় গাভাসকারকে। দেবাশিস দত্তর পায়েও সেই কবে থেকেই চাকা লাগানো। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক শহর থেকে অন্য শহর।
ক্রিকেটার–সাংবাদিক সম্পর্কের আঙ্গিক থেকে সেই কোনকাল আগে এই সম্পর্ক নিয়েছে অন্য এক মাত্রা।

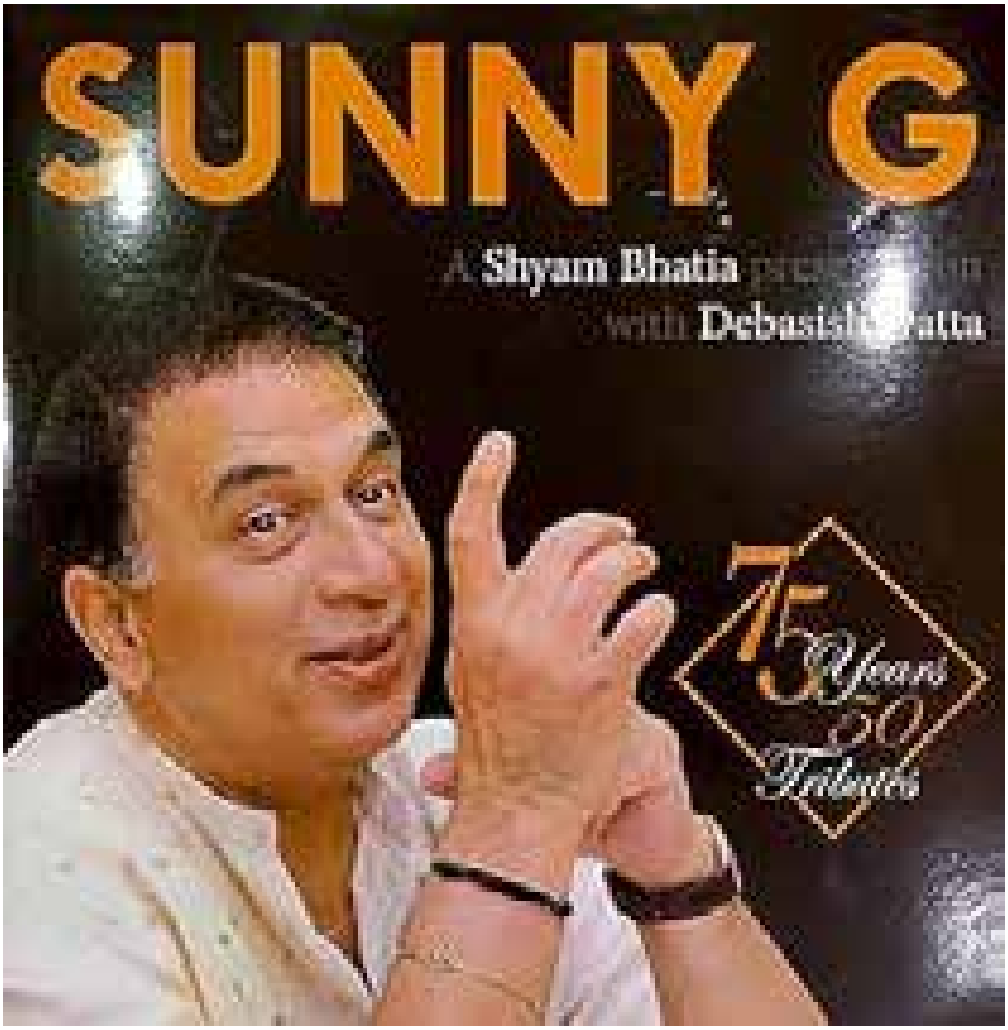

সেই সুনীল গাভাসকার পেরিয়ে গেলেন পচাত্তর বছরের মাইলস্টোন। লন্ডনে পালিত হল জন্মদিন। গ্যারি সোবার্স থেকে ক্লাইভ লয়েড, জিওফ্রে বয়কট থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি— যেন তারকার মেলা। কত উপহার যে জমা পড়ল! সব প্যাকেটবন্দি। আচ্ছা,

সেদিন প্রেস বক্সের সেই পাশে বসা লোকটা কী উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি তুলে দিয়েছিলেন দুটি বই। একটি ইংরাজি, অন্যটি বাংলা। এত এত উপহারের মধ্যে থেকে একটিরই প্যাকেট খুললেন সানি। উল্টে পাল্টে, নেড়ে চেড়ে দেখলেন বই দুটি।

দুটো বই আসলে নিছক দুটো বই নয়। একটা দীর্ঘ সম্পর্কের উদ্‌যাপন। একটা লম্বা পথ চলার গুরুদক্ষিণা। সেইসঙ্গে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে ক্রিকেটের বিবর্তনের ইতিহাস।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সাক্ষাৎকারে, ঘরোয়া আড্ডায় দেবাশিস দত্ত একটি কথা প্রায়ই বলেন, আমার বাবা গৌরীশঙ্কর দত্ত। কিন্তু এছাড়াও আমার আরও তিনজন বাবা আছেন,

যাঁরা আমাকে জন্ম দেননি। কিন্তু আমার জীবনে তাঁদের ভূমিকা বাবার থেকে কম নয়। একজন অশোক দাশগুপ্ত, যিনি আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়েছেন। একজন পিকে ব্যানার্জি, যিনি মানুষ চেনার চোখ খুলে দিয়েছেন। একজন সুনীল গাভাসকার, বছরের পর বছর যিনি আমাকে আগলে রেখেছেন, বস্তাভর্তি এক্সক্লুসিভ খবর দিয়ে গেছেন।

সুনীল গাভাসকার সংক্রান্ত কোনও খবর মানে, সেটা প্রথম প্রকাশিত হবে আজকালে। সেখান থেকে ফলো আপ করবেন অন্যরা। ক্রিকেট ও মিডিয়ার দুনিয়ায় এটা নিয়ে তেমন কোনও লুকোছাপা নেই। এত এত এক্সক্লুসিভ। তার মধ্যে যদি সেরা বাছতে বলা হয়! পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৮৭ তে। অনেক

আগেই ডন ব্র্যাডম্যানের সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছেন। আমেদাবাদে দশ হাজার রানের মাইলস্টোনেও পৌঁছে গেছেন। বেঙ্গালুরু ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি উইকেটে সেই ৯৬ রানের ইনিংসও খেলে ফেলেছেন।

মুম্বইয়ের বেঙ্গল লজে নির্দিষ্ট ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। ওপারে সুনীল গাভাসকার। সরাসরি জানতে চাইলেন, লন্ডনে এমসিসির বাই সেন্টিনারি ম্যাচ। আসতে পারবে?

যাঁর কাছে জানতে চাইলেন, এই ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে তাঁর পাসপোর্টে অন্তত একশোবার ইংল্যান্ডের ছাপ পড়েছে। কিন্তু ঘটনাটা সাতাশির। তখন সেই তরুণ সাংবাদিকের কাছে লন্ডনে যাওয়া আর চাঁদে যাওয়া প্রায়

একই ব্যাপার। তাই সেদিনের সেই সাংবাদিক প্রিয় ‘সানিভাই’কে বলেই বসলেন, ‘আগে তো কখনও যাইনি, অফিস পাঠাবে কিনা বলতে পারছি না।’ ওদিক থেকে ক্রিকেটের তেনজিং নোরগের আশ্বাস, ‘অফিসে বলো, ওখানে গেলে, একটা সুপার ইন্টারন্যাশলান স্কুপ হবে।’

গাভাসকার তখন ক্রিকেট জীবনের পশ্চিম সীমান্তে। হোল্ডিং, রবার্ট, মার্শাল, গার্নার, লিলি, টমসন, ইমরান— কত দিকপাল বোলারকে সামলেছেন হেলমেট ছাড়াই। হয়তো সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন, কার কাছে কোনটা প্রিয়। ‘লন্ডন দারুণ শহর, ঘুরে আসবে চলো’ এমনটা বললে এই তরুণ তেমন আগ্রহী হবে না। এই ছোকরা খবরের

গন্ধ বোঝে। এই ছোকরা শুধু খবর খোঁজে। তাই একে খবরের

টোপ দিতে হবে। সেটাই তার কাছে পৃথিবীর সবথেকে মহার্ঘ্য। এক্সক্লুসিভের গন্ধ পেলেই উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুও চলে যেতে পারে।

অগত্যা, দেবাশিস দত্ত জানালেন সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে। আজকাল মনে তখন মধ্যবিত্তের টানাটানির সংসার। দুম করে তো আর লন্ডনে পাঠানো যায় না। সম্পাদক জানতে চাইলেন, 'আরে, খবরটা কী, সেটা তো জানতে হবে।' সানির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বেশ নিবিড়। এই আজকাল প্রকাশন থেকেই একসময় বেরোতো সারা দেশে সাড়া ফেলে

দেওয়া ‘ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার’। যার অতিথি সম্পাদক ছিলেন সুনীল গাভাসকার। কিন্তু গাভাসকারের মজবুত ডিফেন্স। ভাঙতে চাইলেন না। শুধু এটুকু বললেন, ‘যা হবে, তুমিই পাবে।’

এমসিসির বাই সেন্টিনারি ম্যাচ কভার করতে পৌঁছে গেলেন দেবাশিস দত্ত। কিন্তু খবরটা কী? তাঁর মনেও যেন খচখচ করছে। চারপাশে এত তারকার মেলা। এই হেঁটে যাচ্ছেন মার্শাল, ওপাশে রিচার্ড হেডলি। এদিকে ইমরান তো ওদিকে মাইক গ্যাটিং। কিন্তু কোনও দিকেই যেন মন নেই। কেন এতদূর তাঁকে উড়িয়ে আনা হয়েছে, জানতেই হবে।

অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সুনীল

গাভাসকার জানিয়ে দিলেন, ‘আমি আর টেস্ট খেলব না। এটাই আমার শেষ পাঁচদিনের ম্যাচ। কিন্তু এখনই এই খবর লেখা চলবে না। যেদিন ম্যাচ শুরু হবে, সেদিন যেন ছেপে বেরোয়। তার আগে নয়। আগে তুমি লিখবে। তার পরের দিনে আমি ঘোষণা করব।’

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। সুনীল গাভাসকার অবসর নিচ্ছেন! এতবড় এক্সক্লুসিভ! কিন্তু লেখা যাবে না! যদি অন্য কেউ বুঝে ফেলে! যথারীতি সানি আশ্বস্ত করলেন, ‘ভয় নেই, আর কেউ জানবে না। আমি কাউকে বলব না। আসলে, লর্ডসে আমার কোনও সেঞ্চুরি নেই। তাছাড়া, এই বাইসেন্টিনারি ম্যাচটা খেলার ইচ্ছেও অনেকদিনের। কিন্তু আমি আগে অবসর ঘোষণা করে দিলে আমাকে

আর ডাকত না। তাই যেদিন শুরু হবে, সেদিন সকালে বেরোক। তারপর তো আমাকে বাদ দিতে পারবে না।’

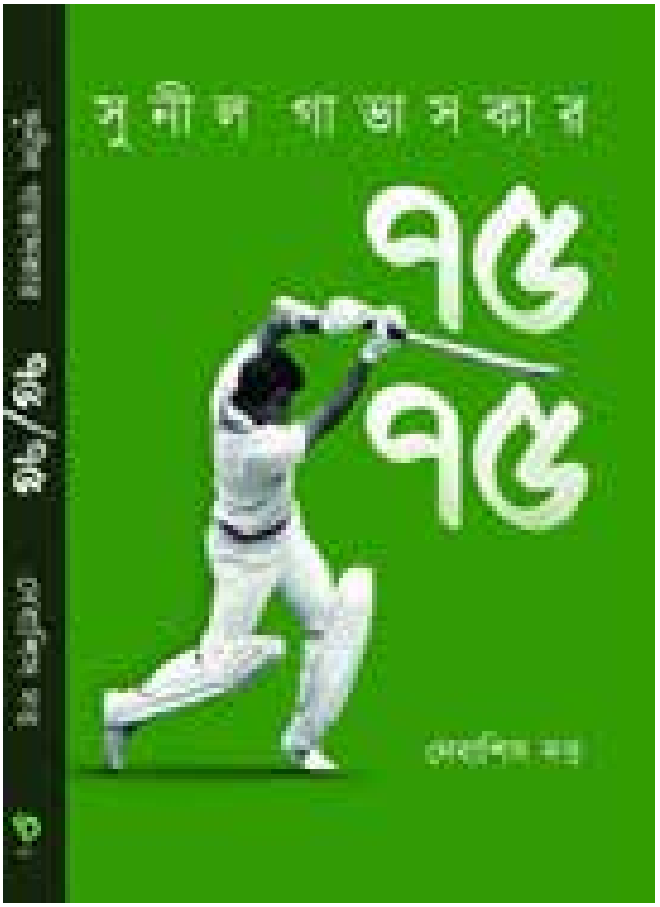

২০ আগস্ট লর্ডসে শুরু হল সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ। সেইদিন সকালেই আজকালের প্রথম পাতায় আট কলাম জুড়ে সেই এক্সক্লুসিভ। সেই ম্যাচে সানি করেছিলেন ১৮৮ রান। লর্ডসে সেঞ্চুরির স্বপ্ন যেমন পূর্ণ হল। তেমনই, আগে দেবাশিস দত্ত এক্সক্লুসিভ করার পর,

ছেপে বেরিয়ে যাওয়ার পর জানালেন ক্রিকেট বিশ্বকে।

কৃতজ্ঞ দেবাশিস মাঝে মাঝেই বলেন, ‘এই মানুষটা আমাকে দু’হাত ভরে দিয়েছেন। যা কেউ কাউকে দেয়নি, দেবেও না।’ ক্রিকেট মহলে দেবাশিস দত্তর একটা পরিচিত নাম হল মাফিয়া। কিন্তু কোন যাদুমন্ত্র বলে এই ‘মাফিয়া’ গাভাসকারের এমন বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন, তা নিয়ে গবেষণা হতেই পারে। সম্পর্কের সুর কোন তারে বাঁধা হয়েছিল, জানা নেই। তাই হয়তো প্রেস বক্সে ওই ফাঁকা চেয়ারটায় এসে ঠিক বসে পড়েন। ঠিক তেমনই, স্টার স্পোর্টসের কমেন্ট্রি বক্সেও দেবাশিস দত্তর তেমনই অবারিত দ্বার।

এবার বইয়ে আসা যাক। আগেই লিখেছি, এই বই একটা সম্পর্কের উদযাপন। ইংরাজি বইয়ের নাম? SUNNY G. জি কেন? অনেকরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। হতে পারে, জি গাভাসকার পদবির আদ্যক্ষর। হতে পারে, নামের পর সম্মানসূচক 'জি' সম্বোধন (যেমন, অমিতাভজি, লতাজি)। গাভাসকারের ষাট বর্ষপূত্তিতেও (২০০৯) ষাটটি লেখার সংকলন নিয়ে অভিনব উপহারের ডালি সাজিয়েছিলেন দেবাশিস। সেই বইয়ের নাম ছিল, 'সুনীল গাভাসকার দ্য লিটল মাস্টার।'

আরেকজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি শ্যাম ভাটিয়া। দুবাইয়ের এক ব্যবসায়ী। বাড়িতে রয়েছে ক্রিকেট মিউজিয়াম। রয়েছে দিকপাল ক্রিকেটারদের দুষ্প্রাপ্য সব স্মারক।

আরও বড় পরিচয়, গাভাসকারের অনুরাগী। তাঁরও ইচ্ছে ছিল, গাভাসকারকে দারুণ কোনও উপহার দেওয়ার। ইচ্ছে ছিল, গাভাসকারের টেস্ট অভিষেকের পঞ্চাশ বছরে (২০২১) জমকালো কিছু একটা করার। কিন্তু করোনা আবহে তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে এল সানির পচাত্তর বছরে কোনও একটা উপহার দেওয়ার সুযোগ। চাইলেন, নানা পঙের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার এক মালা গাঁথতে। জানতেন, সানিভাইকে তিনি যেভাবে শ্রদ্ধা জানাতে চাইছেন, তা হয়তো একজনই বাস্তবায়িত করতে পারেন। মিলে গেল দুবাই–কলকাতা। শ্যামের বাঁশি তুলে নিলেন দেবাশিস। শ্যাম ভাটিয়ার শুধু একটাই আর্জি ছিল, ‘গাভাসকারের ওপর এ যাবৎ যত বই হয়েছে, তার মধ্যে এটা যেন সেরা

হয়।’ কিন্তু হাতে সময় তো অল্প। তিন মাসও বাকি নেই। দুই মলাটে এত দিকপালকে ধরা কি চাট্টিখানি কথা! সকালে সোবার্স, তো দুপুরে লয়েড। এক ফোনে বয়কট, তো অন্য ফোনে জাহির আব্বাস। তালিকা বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে থামল! বাদ গেলেন না ভারতীয় কিংবদন্তিরাও। গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, মোহিন্দার অমরনাথ, কপিলদেব, শচীন তেন্ডুলকার। একেক লেখার সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য সব ছবি। ই মেল, হোয়াটসঅ্যাপের যুগে ছবি পাওয়া হয়তো কঠিন নয়। তবু স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেননি। দুষ্প্রাপ্য ছবির খোঁজে উড়ে গেছেন দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই। উঁকি মারতে হয়েছে অনেকের ব্যক্তিগত অ্যালবামে। আর লেখাগুলি নিছক নিষ্প্রাণ রচনাবলি নয়। নিছক ওজনদার নামের ভীড়

নয়। একেকজন তুলে ধরেছেন একেকটা আঙ্গিক। প্রতি লেখার পরতে পরতে যেন ধরা দিচ্ছেন অজানা এক সানি।

শুধু সেলিব্রিটি নয়, খুঁজে বেড়িয়েছেন এমন এমন মানুষকে, যাঁদের আমরা চিনিই না, কিন্তু যাঁদের ঝুলিতে অনেক গল্পের সম্ভার। যেমন ধরা যাক, বিজয় ভোসলে। অতি বড় সানি অনুরাগীও নিশ্চিতভাবে নামটা শোনেননি। প্রবীণ এই মানুষটি থাকেন অকল্যান্ডে, মেয়ের কাছে। যে বইয়ে সোবার্স, লয়েডদের মতো দিকপাল লোকেরা লিখছেন, সেই বইয়ে হঠাৎ অখ্যাত বিজয় ভোসলের লেখা কেন? কী তাঁর পরিচয়? আসলে, তিনি ছিলেন গাভাসকারের প্রতিবেশী। সানি যখন ১৯৭১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নির্বাচিত

হলেন, তখন তাঁর কোনও কিটব্যাগ ছিল না। এই বিজয় ভোসলের কিট ব্যাগ নিয়েই পাড়ি দিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। সেই সিরিজেই এল ৭৭৪ রান। ফিরে এসে কৃতজ্ঞ সানি সেই কিট ব্যাগ ফেরত দিতে গেলেন। কিন্তু বিজয় ভোসলে কিছুতেই ফেরত নেবেন না। কিন্তু অন্যের জিনিস ফেরত না দিলেই বা কেমন দেখায়! তাই সানি ফেরত দিলেন। তারপর সেই কিট ব্যাগের কী হল? নিশ্চয় সাজানো আছে! নিশ্চয় কোনও মিউজিয়ামে আছে! না, সেই কিট ব্যাগ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন বিজয় ভোসলে। হঠাৎ এমন পাগলামো কেন? মর্মস্পর্শী লেখায় অকল্যান্ড থেকে সেই প্রবীণ লিখেছেন, ‘এত বড় স্মৃতি রাখতে পারতাম না। এর ভার বইতে পারতাম না। তাই পুড়িয়ে ফেলেছি।’

এমন অনেক অজানা কাহিনি, এমন অনেক মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়।

আর বাংলা বই! এই উপহার যেন আরও মহার্ঘ্য। প্রচ্ছদের সবুজ ক্যানভাস যেন সবুজ মাঠ। তার মাঝে ব্যাটিংরত সাদা পোশাকের ঝকঝকে সানি। ৭৫ বছরে ৭৫টি লেখার ডালি সাজিয়ে মন ছুঁয়ে যাওয়া এক শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাবা মনোহর গাভাসকার, মা মীনাল গাভাসকারের চোখে ছেলের কথা যেমন আছে, তেমনই আছে সানির প্রথম অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার বা একদা ওপেনিং সঙ্গী গোপাল বসুর লেখাও। এঁরা কেউই আর পৃথিবীতে নেই। লেখাগুলো থেকে গেছে। যেমন থেকে গেছে মান্না দে বা লতা মঙ্গেশকারের স্মৃতিচারণও। বইটি শুরুই হচ্ছে সাতাশিতে

লেখা অশোক দাশগুপ্তর দুরন্ত একটি লেখা দিয়ে। সানি কি নিছক একজন ক্রিকেটার! নিছক একজন ধারাভাষ্যকার! ছোট্ট নাম, কিন্তু ব্যাপ্তিটা যে বিশাল। সেই হিমালয়কেই যেন স্পর্শ করার চেষ্টা এই দুটি বইয়ে। কিন্তু এমন দুটি বই প্রকাশ করতে কারা এগিয়ে এল? ইংরাজি ও বাংলা, দুটি বই–ই জন্ম নিল দীপ প্রকাশনের গর্ভগৃহ থেকে। এমন আন্তর্জাতিক মানের ইংরাজি বই কলকাতার প্রকাশক দিনের আলো দেখাচ্ছেন, ভাবতে গর্ব হয় বৈকি।

শুরুতে লেখা কথাগুলোর জন্য এবার নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই ভাল। না, এই বই কখনও জন্মদিনের উপহার হতে পারে না। এই বই শুধু গুরুদক্ষিণাও নয়। অনেক

বইয়ের ভিড়েও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে, চিরন্তন তকমা নিয়ে বই দুটো থেকে যাবে। হয়ে উঠবে মহাকালের কাছে সমকালের উপহার।

***

❑ SUNNY G

❑ সুনীল গাভাসকার ৭৫

দেবাশিস দত্ত

দীপ প্রকাশন

একাত্তরের রূপকথা, মহাজীবনের উত্থান

কপিলদেবের সেই অপরাজিত ১৭৫। কত লোক সেই ইনিংসের স্মৃতিচারণ করেন। কার বাড়ির টিভিতে দেখেছিলেন, সেটাও গড়গড় করে বলে যান। কিন্তু ঘটনা হল, সেই ম্যাচটা টিভিতে দেখানোও হয়নি। এমনকী, সেই ইনিংসের কোনও রেকর্ডিং খোদ কপিলদেবের কাছেও নেই। আসলে, তিরাশি এমনই এক রূপকথা, সবাই যার সাক্ষী থাকতে চায়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সবাই যে সচেতন মিথ্যে বলেন, এমনটা নয়। আসলে, মনে মনে তাঁরা ভাবতে থাকেন, সত্যিই বোধ হয়

দেখেছি। সেই বিশ্বাসটাই ক্রমে জাঁকিয়ে বসে।

প্রাক তিরাশি ভারতীয় ক্রিকেটে তেমনই এক রূপকথার জন্ম একাত্তরে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারানো! তাও আবার এমন দল নিয়ে, যে দলে না ছিলেন ভাল মানের জোরে বোলার, না ছিল তেমন মিডল অর্ডার। শুধু চার স্পিনারের ওপর ভর করে ফাস্ট বোলিংয়ের স্বর্গরাজ্যে পাড়ি দেওয়া! না ছিল পতৌদির মতো ওজনদার নেতা, না ছিল ঈর্ষণীয় টিম স্পিরিট। এত কিছু নেই–এর ভীড় সরিয়ে কীভাবে এসেছিল সেই রূপকথার জয়! পঞ্চাশ বছর পর সেই গৌরবগাথা নিয়েই গৌতম ভট্টাচার্য ও বোরিয়া মজুমদারের দুরন্ত বই ‘গাভাসকারের জন্ম’।

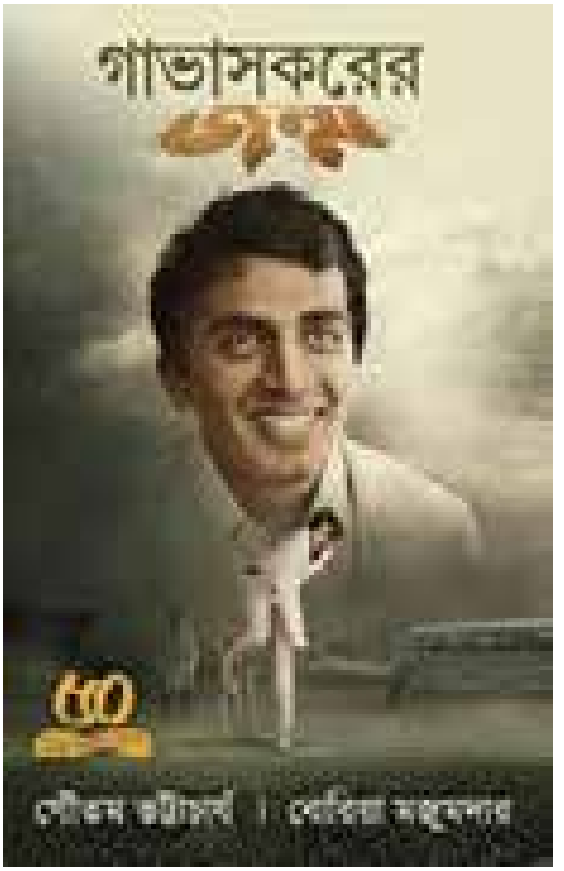

বইটা বাংলার পাশাপাশি ইংরাজি ভাষাতেও বেরিয়েছে। সেখানে কিন্তু নাম ‘১৯৭১’। তাহলে, বাংলায় ‘গাভাসকারের জন্ম’ নাম কেন? প্রশ্ন উঠতেই

পারে। লেখকদের ব্যাখ্যাও আছে। সেই ব্যাখায় পুরোপুরি একমত হওয়া বা না-হওয়াটা পাঠকের নিজস্ব স্বাধীনতা। আসলে, সেই সিরিজ যেমন মহাকাব্যিক জয়ের একটা মাইলস্টোন, তেমনি সেই সিরিজ জন্ম দিয়েছিল সুনীল গাভাসকার নামের এক কিংবদন্তিকে। পরবর্তীকালে যিনি দশ হাজার

রানের এভারেস্টে পৌঁছে যাবেন, ৩৪ টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক হবেন, পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হয়ে উঠবেন, সেই মহাজীবনের উত্থান তো এই সিরিজেই। সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি, দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি সব ওই প্রথম সিরিজেই। সিরিজে ৭৭৪ রান! যা ক্রিকেট লোকগাথায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সেই দুরন্ত অভিষেকেরও তো সুবর্ণ জয়ন্তী।

তাই বলে এই বই গাভাসকারের উত্থানে আচ্ছন্ন নেই। গোটা বই জুড়ে গাভাসকারের কথা দশ শতাংশও নেই। তাহলে কী আছে? যা আছে, তা কোনও অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। এতদিন সেভাবে উঠেও আসেনি। একটা সিরিজকে ঘিরে এত কিছু ঘটেছিল!

পতৌদি, গাভাসকার, ওয়াদেকার, প্রসন্নদের আত্মজীবনীতে বিক্ষিপ্তভাবে নানা কথা উঠে এসেছে। কিন্তু পুরো ক্যানভাসটা ধরা পড়েনি। ধরা পড়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, তাঁরা নিজেদের অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু গবেষকের নির্মোহ দৃষ্টি ছিল না। বা সবটা বেআব্রু করা তাঁদের পক্ষে হয়তো শোভনীয়ও ছিল না। একদিকে না থেকেও প্রবল ছায়া পতৌদির। অন্যদিকে হঠাৎ করে নেতৃত্ব পাওয়া মধ্যবিত্ত ব্যাঙ্কার ওয়াদেকার। বিভাজনটা অদৃশ্য হলও প্রায় আড়াআড়ি থেকে গিয়েছিল। শুধু তারকার ঝলমলে উপস্থিতি নয়, যাঁরা নিষ্ফলের হতাশের দলে থেকে গিয়েছেন, এই সিরিজের পর যাঁদের আর কখনও ক্রিকেটীয় আঙিনায় দেখাই যায়নি, তাঁদের কথা–যন্ত্রণাও উঠে এসেছে

প্রায় একইরকম গুরুত্ব ও সহমর্মিতা নিয়ে।

এ শুধু গবেষণা নয়, তার থেকে অনেক বেশি কিছু। লাইব্রেরিতে কয়েকটা বই ঘেঁটে বা জীবিত কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই দুর্মূল্য বই লেখা সম্ভব ছিল না। সোলকার সেই কবেই মারা গেছেন। টাইগার পতৌদি, অজিত ওয়াদেকার, অশোক মানকড়, দিলীপ সরদেশাই, জয়সীমা, কৃষ্ণমূর্তিরাও নেই। কিন্তু নানা সময়ে তাঁদের নানা স্মৃতিচারণও আছে। কিছু অন দ্য রেকর্ড, কিছু অফ দ্য রেকর্ড। অর্থাৎ, এই বইয়ের প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবেই কয়েক দশক আগে থেকে নেওয়া। অভিজ্ঞ সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য প্রায় চার দশক ধরে কাছ থেকে দেখে আসছেন ভারতীয় ক্রিকেটের নানা চড়াই-উতরাই। নিবিড়

সান্নিধ্য পেয়েছেন অতীতের দিকপালদেরও। সেই অভিজ্ঞতা এই বইয়ের বড় একটা সম্পদ। আবার পাশাপাশি দরকার ছিল যথার্থ গবেষণা ও ক্রিকেট ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টি। সেই অভাবটা পূর্ণ করেছেন গবেষক বোরিয়া মজুমদার। সবকিছুকে এক মলাটে আনতে দরকার ছিল পর্যাপ্ত সময়, যত্ন আর সমন্বয়। দীর্ঘ লকডাউন এক্ষেত্রে যেন শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে। বিষয় বিন্যাস আর ঝরঝরে গদ্য টেনে নিয়ে যায় শেষ পাতা পর্যন্ত।

অজানা কাহিনিগুলো নিয়ে আস্ত একটা উপন্যাস হতে পারে না! কেউ কেউ চেষ্টা করে দেখতেই পারেন। তাতে ক্রিকেট সাহিত্য আরও একটু সমৃদ্ধ হতে পারে। তিরাশির বিশ্বজয় নিয়ে ছবি হচ্ছে। একাত্তরও

কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। এই বই যেন সেই সম্ভাবনাকেও উস্কে দিয়ে গেল।

***

গাভাসকারের জন্ম
গৌতম ভট্টাচার্য, বোরিয়া মজুমদার
দীপ প্রকাশন

তিনি দিয়ে গেলেন আস্ত একটা নদী

সম্পর্কের শুরুটা সেই ৪৪ বছর আগে। জিওফ্রে বয়কট তখন কিংবদন্তি। ঠিক আগের টেস্টেই স্যর গ্যারি সোবার্সের সর্বাধিক রানের রেকর্ড ছাপিয়ে এসেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তিনিই তখন সবথেকে বেশি রানের মালিক। এসেছেন ইডেনে টেস্ট খেলতে। প্র্যাকটিসে হাজির আনকোরা এক তরুণ। নাক উঁচু সাহেব জানতে চাইলেন, কী চাই? সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া কাগজের একুশের নাছোড়বান্দা তরুণ আমতা আমতা করে বললেন, ‘ইন্টারভিউ’। কী ভেবে কী জানি, বয়কট রাজি হয়ে গেলেন। ডেকে নিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে।

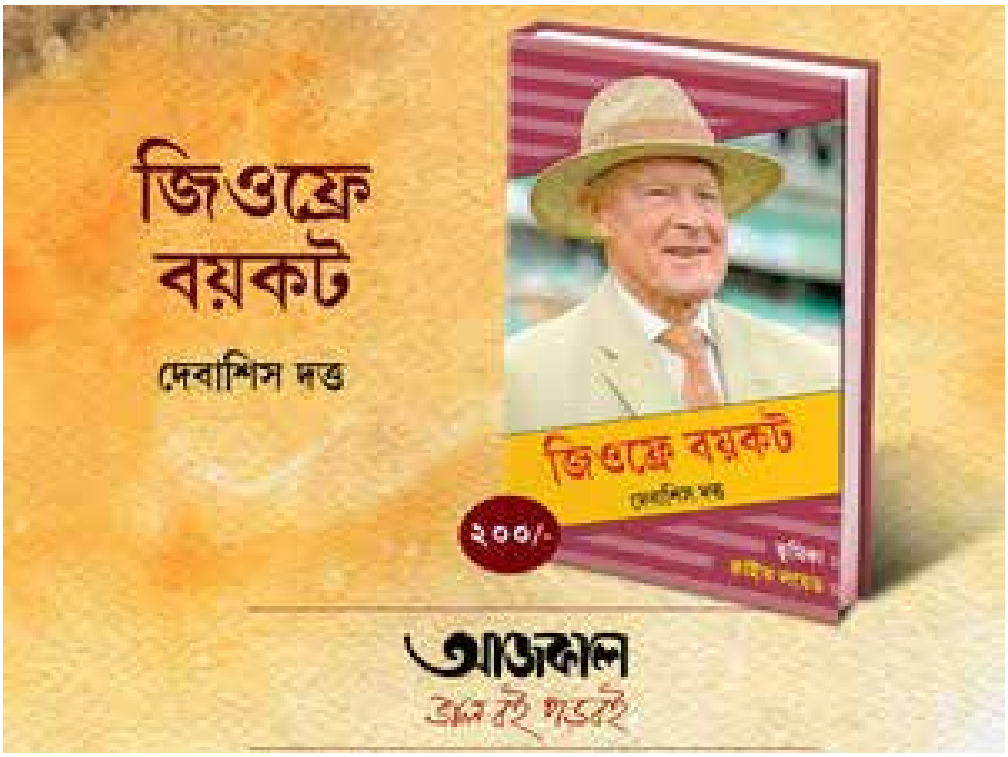

সেই শুরু। কিন্তু এই শুরু আসলে কিছুই নয়। তখন অধিনায়ক কিথ ফ্লেচারের সঙ্গে কোনও একটা কারণে তাঁর বিবাদ চরমে। ইডেন টেস্ট চলাকালীন একুশের সেই ছোকরাকে নিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন টালিগঞ্জ গল্‌ফ ক্লাবে। সতীর্থরা ইডেনে, আর তিনি কিনা গল্‌ফ ক্লাবে! সেখান থেকেই তরুণ সাংবাদিককে নিয়ে সোজা চলে গেলেন বিমানবন্দরে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে একা একাই দেশে

ফেরার বিমানে উঠে পড়লেন। ক্রিক ইনফোর পরিসংখ্যান বলছে, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট। তরুণ সাংবাদিক চেয়েছিলেন নিছক একটা ইন্টারভিউ। আর কিংবদন্তি বয়কট কিনা দিয়ে গেলেন আস্ত একটা 'ওয়ার্ল্ড এক্সক্লুসিভ'। চেয়েছিলেন এক গ্লাস জল, তিনি দিয়ে গেলেন আস্ত একটা নদী।

সেদিনের সেই তরুণের চুলেও কবেই পাক ধরেছে। তিনিও সিনিয়র সিটিজেনের তকমা পেয়েছেন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। সম্পর্কের সেই নদীটা এখনও একইভাবে বয়ে চলেছে। এখনও নিয়ম করে ফোনাফুনি, মেসেজ বিনিময় চলে। দুজনে দুজনকে এতটাই চেনেন, অনেক স্বামী–স্ত্রীও একে অন্যকে এতখানি চেনেন কিনা সন্দেহ। একজন তো কিংবদন্তি বয়কট। অন্যজন কে, তা নিয়ে

আর ধোঁয়াশা না রাখাই ভাল। তিনি দেবাশিস দত্ত। ৪৪ বছরে দেবাশিস দত্তর বইয়ের সংখ্যা বহুকাল আগে একশো ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু বয়কটকে নিয়ে বই এই প্রথম। কখনও বইয়ের বিষয় গাভাসকার, কখনও শচীন, কখনও সৌরভ। হাসিমুখে সেইসব বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বয়কট। মাঝে মাঝেই খুনসুটি করতেন, আমাকে দিয়ে কি শুধু ভূমিকাই লেখাবে! আমাকে নিয়ে বইটা কবে হবে? অবশেষে, হয়েই গেল। এই বইয়ের ভূমিকা তো আর বয়কটকে দিয়ে লেখানো যায় না। লিখেছেন আরেক কিংবদন্তি, ক্লাইভ লয়েড। বয়কট কি নিছক একজন সাহেব! প্রথম টেস্টেই যিনি সৌরভকে দেখে বলে বসলেন ‘প্রিন্স অফ কালকুটা’, তিনি নিজের অজান্তেই হয়ে উঠেছে বাঙালির আপনজন।

এই বই মোটেই ইয়র্কশায়ারের ‘চিরতরুণ’ বয়কটের জীবনী নয়। নেট ঘেঁটে তুলে আনা বহুচর্চিত ঘটনার সংকলনও নয়। তাহলে এই বইয়ে আছেটা কী? প্রথম দুই অনুচ্ছেদ থেকে তার কিছুটা আভাস নিশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে। ৪৪ বছরের নিবিড় বন্ধুত্বের পর যে বইয়ের জন্ম হয়, তার দুই মলাটের ভেতর কী থাকতে পারে, নিজেরাই ভেবে নিন। আমাদের কুয়োর জীবনে হঠাৎ করেই যেন মহাসমুদ্রের হাতছানি। সাঁতার দিতে দিতে অতল গভীরে পৌঁছে যাওয়া। যেখানে অন্তত সবজান্তা গুগল বাবাজীবনের প্রবেশাধিকার নেই।

*****

জিওফ্রে বয়কট

দেবাশিস দত্ত

আজকাল

যাঁদের পড়ার কথা, তাঁদের সময় কই!

রবিবার শব্দটা একেকজনের কাছে একেক রকম ভাবে ধরা যায়। অনেকের কাছেই নির্ভেজাল একটা ছুটির দিন। কারও কাছে দুপুরে খাসি মাংস, ভাত খেয়ে ভাতঘুমে দেওয়ার দিন। কারও কাছে টুকটাক বেরিয়ে পড়ার দিন। ছোটদের কাছে রবিবার মানে খেলাধূলার দিন। কারও কাছে আরও বেশি করে মোবাইল ঘাটার দিন।

আমি বাপু কুঁড়ে মানুষ। তার ওপর বিস্তর ব্যাকডেটেড। আমার কাছে রবিবার মানে

বিভিন্ন কাগজের সঙ্গে পাওয়া রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র পড়ার দিন। এমনিতে তিনটে কাগজ নিই। কিন্তু রবিবার এলে চেষ্টা করি আরও দুটো বাড়তি কাগজ নিতে। অন্য পাতাগুলোকে ঘিরে বিশেষ আগ্রহ থাকে না। মূল আগ্রহ ওই রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রগুলোকে ঘিরেই। সব যে পড়তে পারি, এমন নয়। চেষ্টা করি, যতটা পড়া যায়।

ভনিতা না করে সরাসরি মূল প্রসঙ্গে ঢোকাই ভাল। প্রায় এক বছর ধরে আমার বড় একটা আকর্ষণ ছিল ‘অফস্টাম্পের বাইরে’। সংবাদ প্রতিদিনের সঙ্গে বিশেষ ক্রোড়পত্র ‘রোববার’। খুব উন্নতমানের ম্যাগাজিন। সেই শুরু থেকেই পড়ি। আগে সম্পাদক ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ, এখন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

এই রোববারেই প্রায় এক বছর ধরে বেরোচ্ছিল সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্যের ‘অফস্টাম্পের বাইরে’।

প্রায় চার দশকের সাংবাদিক জীবনের নানা ওঠাপড়া নিয়ে দুরন্ত একটি স্মৃতিচারণধর্মী লেখা। ঠিক জীবনী বলা যাবে না। বরং তারকাদের জীবনের নানা অজানা কথা। সেইসঙ্গে ক্রীড়াসাংবাদিকতার নানা বাঁকও উঠে এসেছে লেখকের বলিষ্ঠ কলমে। পেশাগত লড়াইয়ে আবহটা আটের দশকে কেমন ছিল, এখনই বা কেমন।

কোনও বিদেশ সফরে যাওয়ার আগে কেমন প্রস্তুতি নিতে হত, এখন সেই প্রস্তুতির ছবিটা কেমন। সাবেকি কাগজের সাংবাদিকতা থেকে ডিজিট্যাল মিডিয়ার বিবর্তন। কোন সাক্ষাৎকার পেতে গিয়ে কেমন কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আবার কোন খবরটা মেঘ না চাইতেই জলের মতো ধরা দিয়েছে। রাতের শেষে একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে ঘুমোতে যাওয়া, পরদিন কোন কাগজে কোন কপি বেরিয়ে যাবে। সতীর্থদের ভূমিকাই বা কেমন, পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভূমিকাই বা কেমন। কোনও একপেশে আলোচনা নয়। অকপটে সেই সময়ে নিজের ভেতর চলা নানা ঘাত-প্রতিঘাতও ধরা দিয়েছে। স্মৃতির আলপথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে কখনও কঠোর আত্মসমালোচনাও করেছেন। একটা

লেখা, চারপাশের ছবিটাকে কী নিপুণভাবে ক্যানভাসে ধরতে পারে।

বিশ্ব খেলাধূলার জগৎকে এত কাছ থেকে কজন বাঙালি সাংবাদিক দেখেছেন? তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র দেবাশিস দত্তর নাম আনা যেতে পারে। তৃতীয় কোনও নাম? চোখে হাই পাওয়ারের দূরবিন লাগিয়েও দেখা যাচ্ছে না। পিকে-অমল, উত্তর-সৌমিত্রর মতোই দেবাশিস-গৌতম দ্বৈরথও প্রায় চার দশক ধরে উপভোগ করেছে বাঙালি পাঠক। একজন একের পর এক খবর করে চমকে দিয়েছেন। অন্যজন দুরন্ত লেখনিতে বাঙালিকে আবিষ্ট করে রেখেছেন।

যাঁরা এই কলমের স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা

অদ্ভুত এক মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। কিন্তু এই প্রজন্মের ক্রীড়া সাংবাদিকরা কি সত্যিই পড়লেন? সত্যিই কিছু শিখলেন? সেটাই মোক্ষম প্রশ্ন। একটা আস্ত প্রজন্ম লাইক দিতে আর লাইক গুনতেই ব্যস্ত। তাঁদের কাছে অন্যের লেখা পড়ার সময় কোথায়? এমন একটা দুরন্ত ধারাবাহিক নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল। বইমেলায় এক মলাটে বই হয়ে হাজির হল। নিশ্চিতভাবেই বইটা থেকে যাবে মহাকালের কাছে দলিল হয়ে। যাঁরা প্রতি রবিবার ধারাবাহিকভাবে পড়ার সুযোগ পাননি, বা পেয়েও হাতছাড়া করেছেন, তাঁদের সামনে প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ। গুণগ্রাহী পাঠক নিশ্চয় আছেন। কিন্তু যাঁদের সবার আগে পড়ার কথা, সেই সাংবাদিকরা বা সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা

হয়ত সেই পাঠকবৃত্তের বাইরেই থেকে যাবেন। এটাই সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি।

***

অফস্টাম্পের বাইরে
গৌতম ভট্টাচার্য
দীপ প্রকাশন

বিশ্বকাপের মহাসমুদ্রে ১০০ স্মৃতির তরঙ্গ

ফুটবলে তেমন বিভ্রান্তি নেই। সেখানে বিশ্বকাপ বলতে চার বছর বাদে হওয়া বিশ্বকাপকেই বোঝায়। কিন্তু ক্রিকেটে বিশ্বকাপ বললে ইদানীং কেমন যেন গুলিয়ে যায়। একদিনের বিশ্বকাপ তো ছিলই। দেড় দশকের বেশ সময় ধরে যোগ হয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। তার আবার চার বছর তর সয় না। দু'বছরের মাথায় হাজির হয়ে যায়। ইদানীং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকেও কেউ কেউ টেস্টের বিশ্বকাপ বলতে শুরু করে দিয়েছেন। হিসেবটা দাঁড়াল, চার বছরে পাঁচখানা বিশ্বকাপ। সবমিলিয়ে বেশ গোলমেলে ব্যাপার। কার গ্রাফ পড়ছে, কার গ্রাফ উঠবে, তা নিয়েও নানা জটিল তত্ত্ব।

বিপণনের দুনিয়া যে ব্যাখ্যাই হাজির করুক, আমজনতা বিশ্বকাপ জয় বলতে সেই তিরাশিকেই বোঝে। তারপর বোঝে ২০১১ কে। যতই আইপিএলের আবহ আসুক, একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতই আশঙ্কার চোরাস্রোত থাকুক, আমজনতার কাছে বিশ্বকাপ মানে সেই পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের আসরে যদি কোনও সাংবাদিক টানা দশবার হাজির থাকেন, তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে! তাঁর গল্পের ঝুলি কতটা পর্বতসম হতে পারে! তিনি যদি দুরন্ত কলম হাতে কোনও বইয়ে বিশ্বকাপ–স্মৃতির ঝুলি উজাড় করে দেন, পাঠকের কাছে সেটা কতখানি মহার্ঘ্য উপহার হতে পারে!

পুজোর আগে বাঙালি মেতে থাকত পুজো সংখ্যা নিয়ে। কিন্তু এবার পুজোর আবহে এসে

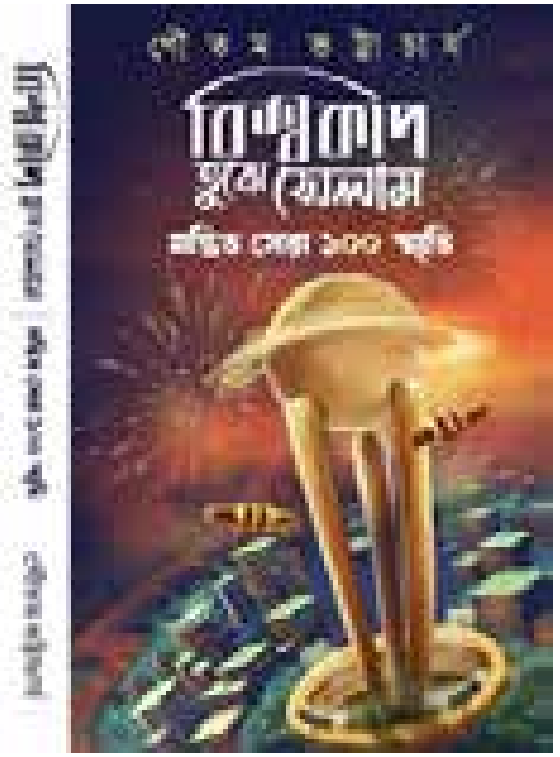

গেল ‘বিশ্বকাপ তুঝে সেলাম’। লেখক গৌতম ভট্টাচার্য। প্রকাশক: দীপপ্রকাশন।পুজো তো প্রতিবারই আসে। কিন্তু এবার সেই আবহে যোগ হয়েছে বিশ্বকাপ। লেখক যথারীতি ল্যাপটপ আর ট্রলি ব্যাগ নিয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন এই শহর থেকে সেই শহর। বিশ্বকাপের অভিযান শুরু হয়েছিল সেই সাতাশিতে। এই ২০২৩ এও তিনি ছুটছেন। ছুটেই চলেছেন। টানা দশটি বিশ্বকার কভার করার অভিজ্ঞতা এই বাংলায় দুজন সাংবাদিকের রয়েছে। একজন গৌতম ভট্টাচার্য, অন্যজন দেবাশিস দত্ত। সারা ভারতেও সম্ভবত

এই দুজনই। সেদিন ছিলেন তরুণ, এখন বয়স বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহ আর উদ্যমে এই দুজনই এখনও যে কোনও তরুণকে দশ গোল দিতে পারেন।

বইয়ের কথায় আসা যাক। কী আছে এই বইতে? দশটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে সেরা একশো স্মৃতি। তিরাশির বিশ্বজয়ের ঠিক কয়েকদিন পর লেখকের পাকাপাকি ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসা। কিন্তু তিরাশিকে বাদ দিয়ে কি বিশ্বকাপের স্মৃতি রোমন্থন সম্ভব? তাই তিরাশির অজানা কিছু গল্পও এসেছে সেই একশো স্মৃতির ভীড়ে। আর সাতাশির আগে তো পুরোদস্তুর ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে ঢুকেই পড়েছেন। এমন কিছু অজানা গল্প যা হয়ত সেই সময়ের প্রতিবেদনেও জায়গা পায়নি। হয়ত তখন জানাও ছিল না।

সাতাশিতে যেমন পেয়েছেন গাভাসকারের অস্তরাগের ছটা, তেমনই বিরানব্বইয়ে শচীনের আগমনবার্তা। মাঝে সৌরভ, ধোনি হয়ে বিরাট কোহলি। বদলে যাওয়া সময়, বদলে যাওয়া প্রজন্ম, বদলে যাওয়া চরিত্র। এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায় মানে যেন সেই বিবর্তনেরই যাত্রাপথ।

তবে মোটেই সেই সময়ের লেখার সংকলন নয়। বরং এই সময়ে চোখ দিয়ে ফেলে আসা সময়কে খোঁজার চেষ্টা। শুধু কি ক্রিকেটের বিবর্তন! একইসঙ্গে সাংবাদিকতারও বিবর্তন। সেদিনের টেলেক্স থেকে ফ্যাক্স হয়ে ল্যাপটপে আগমন। আর এবার তো মোবাইল বাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। টি২০-র আবহে পড়ার অভ্যেস ও ধৈর্য কমছে! সেটা মাথায় রেখেই একেকটা অধ্যায় ধরা দিয়েছে

দেড়, দুই বা আড়াই পাতায়। একটা শেষ হতেই সংক্রমণের রেশ টেনে নিয়ে যাবে অন্যটায়। নিজের অজান্তেই ক্রিকেট রোমান্টিসিজমের নদীতে একটু গা ভিজিয়ে নেওয়া। পুজোর আবহে ক্রিকেট রসিক বাঙালির প্রাপ্তিযোগ নেহাত মন্দ নয়।

***

বিশ্বকাপ তুঝে সেলাম
গৌতম ভট্টাচার্য
দীপ প্রকাশন

আয়নার সামনে যেন নিজেকেই দাঁড় করালেন

মানুষটা বরাবরই বিতর্কিত, বেপরোয়া। খেলোয়াড়জীবনেও সুভাষ ভৌমিক খুব ‘সুবোধ বালক’ ছিলেন, এমন ‘অভিযোগ’ নেই। কোচিং জীবনেও একের পর এক সাহসী সিদ্ধান্তে ডেকে এনেছেন বিতর্ক। সেই মানুষটা যদি আত্মজীবনী লিখতে বসেন, তা যে খুব নিরামিষ হবে না, বলাই বাহুল্য। প্রচ্ছদেই ঘোষণা, ‘বিস্ফোরক আত্মজীবনী’। পাঠককে পড়িয়ে নেওয়ার চটকদার এক শিরোনাম। তবে, শুধু বিস্ফোরণটাই শেষ সত্যি নয়। তার আড়ালে থেকে গেছেন এমন একটা মানুষ, যিনি সারাদিন, রাত শুধু ফুটবলটাই

ভাবতেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নও দেখতেন সেই ফুটবল নিয়ে। ফুটবল নিয়ে এমন তীব্র প্যাশন আর কটা মানুষের আছে! দীপ প্রকাশনের খেলার বইয়ের সম্ভারে আরও এক নতুন মুকুট ‘গোল’।

সুভাষ ভৌমিক মানুষটাই এরকম। যা বলার, চিরকাল সোজাসাপটাই বলে এসেছেন। আর এমন সোজাসাপটা বললে যা হয়! বন্ধু কমে, শত্রু বাড়ে। আত্মজীবনী লিখতে গিয়েও কোনও দাঁড়িপাল্লার হিসেব করেননি। যেটা বিশ্বাস করেন, সেটাই লিখে গেছেন। বই লিখতে বসলেন এমন একটা সময়ে, যখন কিডনি প্রায় অকেজো, নিয়মিত ডায়ালিসিস নিতে হচ্ছে। আর বই প্রকাশ হল এমন সময়ে, যখন এই পৃথিবীর মাঠ ছেড়ে তিনি পৌঁছে গেছেন অন্য এক জগতের মাঠে। সুভাষ

ভৌমিকের অনুলিখন করা একইসঙ্গে সহজ এবং কঠিন। অনুলেখককে বিশেষ ভাবতে হয় না। অনর্গল কথায়, নিখুঁত শব্দচয়ন আর উপমায় প্রায় সবটাই সাজিয়ে দেন। কিন্তু মুশকিলটা হল, ওই গতির সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? সেই কঠিন কাজটাই করেছেন সহলেখক ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা ও সম্পাদনায় গৌতম ভট্টাচার্য। শুরুতেই ভূমিকা লিখেছেন ইন্দার সিং ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ছোট্ট ও প্রাণছোঁয়া একটি

লেখা ‘বন্ধুবর’ অশোক দাশগুপ্তর। শেষপর্বে কলম ধরেছেন সুভাষ-জায়া শুক্লা ভৌমিকও।

বইয়ে কী আছে? তার থেকে বরং উল্টো প্রশ্নটা করাই ভাল, কী নেই? ছত্রে ছত্রে রয়েছে অকপট স্বীকারোক্তি। ‘বিস্ফোরক’ মানে অন্যদের দোষারোপ নয়। তার থেকেও যেন বেশি করে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করানো। জীবনের পশ্চিম সীমান্তে এসে ঠিক সেটাই করে গেলেন সুভাষ। খেলোয়াড়জীবনে শিকল ভাঙার নানা মুহূর্ত যেমন আছে, তেমনই কোচিং জীবনের এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালাও যেন উঁকি মারছেন। নিজেই বলেছেন, ফুটবল জীবনে আমি মোটেই সৎ ছিলাম না, কিন্তু কোচিংটা করেছি তীব্র প্যাশন নিয়ে। কোথায় কোথায় বিচ্যুতি ছিল, জীবন সায়াহ্নে তা লুকিয়ে রাখেননি

আসিয়ানজয়ী কোচ। জমে থাকা একরাশ রাগ–বিরক্তি যেমন উগরে দিয়েছেন, তেমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও কার্পণ্য রাখেননি। মিডিয়া সংসর্গ নিয়ে অনেকেরই ছুৎমার্গ থাকে। এখানেও অকপট, অকৃপণ সুভাষ। তাঁর প্রয়াণের পর ‘যেমন দেখিয়াছি’ মার্কা কত স্মৃতিচারণের বন্যা। তাঁরা হতাশ হতেই পারেন। সুভাষ নিজেই বুঝিয়ে গেলেন, তাঁর কাছে কার মূল্য কতটুকু।

****

গোল

সুভাষ ভৌমিক

সহলেখক: সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন

ষোলআনা সোজাসাপটা

একেকটা সংখ্যা থাকে, যা দিয়ে একেকজনকে চেনা যায়। যেমন, পেলে বা মারাদোনা বললেই আসবে দশ নম্বর। সুব্রত ভট্টাচার্যের জীবনে ১৬ সংখ্যাটার বিস্তার তার থেকেও বেশি। তাঁর জার্সি নম্বর ১৬, এ তো সবাই জানে। গাড়ির নম্বর প্লেটে ১৬, ল্যান্ডলাইন ও মোবাইলের শেষ নম্বর ১৬। আরও কোথায় কোথায় ১৬ ছড়িয়ে আছে, কে জানে! পঁচাত্তরে এসে পড়া তাঁর আত্মজীবনীতেও ‘ষোল’ এড়ানো গেল না। বা বলা যায়, সচেতনভাবেই ষোল-র অনুষঙ্গ আনা হল। নাম— ষোলআনা বাবলু।

এ ঠিক ছোট থেকে বেড়ে ওঠার ক্রমিক বিবর্তন নয়। বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস। কোনওটায়

সতীর্থদের কথা। কোনও অধ্যায়ে কোচেদের কথা। কোথাও নিজের প্রতিবাদের কথা। কোথাও পরিবার ও জামাই সুনীলের কথা। কোথাও বিনোদন জগৎ ও মিডিয়া জগতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা। কোথাও আবেগপ্রবণ, কোথাও অভিমানী, কোথাও প্রতিবাদী। কোথাও মুগ্ধতা, কৃতজ্ঞতা, তো পরের লাইনেই খোঁচা। খারাপের মধ্যে ভালটাকেও খুঁজেছেন। আবার ভালর মাঝে খারাপটাও এসেছে অবলীলায়। নানা সত্তায় বিরাজ করছেন বিতর্কিত ‘বাবলু’। প্রতিটি

অধ্যায়ই যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ। একটা অধ্যায় না পড়লেও পরেরটা বুঝতে কোনও সমস্যা হবে না।

আত্মজীবনী সচরাচর শুরু হয় শুরুর দিনগুলি থেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন ছকভাঙা সুব্রত। শুরুতেই টেনে এনেছেন বিদায়ী ম্যাচের প্রসঙ্গ। ১৯৯১ এর ১৯ মার্চ। এয়ারলাইন্স কাপের ফাইনাল। খেলাটা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল মাঠে। বিদায়ী বিষণ্ণতার সঙ্গে মিশেছে অভিমান, শেষ ম্যাচটা কিনা নিজের মাঠে খেলা হল না! খেলতে হল ইস্টবেঙ্গল মাঠে, অখ্যাত টিএফএ–র বিরুদ্ধে! তাও মাত্র হাজার দশের লোকের সামনে! এমন একটা অখ্যাত টুর্নামেন্টে! তাও আবার বেশিরভাগ সময়ে রিজার্ভ বেঞ্চে! সারা জীবনে স্টপারে খেলে শেষ ম্যাচে কিনা ফরোয়ার্ড! এমন বিবর্ণ বিদায়

কি প্রাপ্য ছিল! শেষ ম্যাচ কি একটা ডার্বি হতে পারত না!

অবসর নেওয়ার কয়েকদিন পরই অ্যাটাচি হাতে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল সেক্রেটারির আগমন। বললেন, ‘অ্যাটাচিতে দশ লাখ টাকা আছে। অন্তত একটা সিজন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলো।’ এতদিন পর ফিরে তাকিয়ে সুব্রত লিখছেন, ‘বাবলু, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরেও তোমাকে এত কঠিন ট্যাকল করতে হবে ভেবেছিলে?’

যে কোনও বইয়ে সবথেকে কম শব্দ থাকে উৎসর্গপত্রে। মেরেকেটে পাঁচ থেকে দশটি শব্দ। কিন্তু ওই কয়েকটি শব্দই যেন অনেক কৃতজ্ঞতার ঋণ রেখে যায়। এই বই উৎসর্গ করা হয়েছে দু’জনকে। মা পুতুল ভট্টাচার্য ও ময়দানি সহযোদ্ধা মহম্মদ হাবিবকে। বইয়ের

ভূমিকা লিখেছেন দু'জন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

সাধারণত পরিসংখ্যান থাকে বইয়ে শেষদিকে। কিন্তু এখানে দুই ভূমিকার পরই ৯ পাতা জুড়ে পরিসংখ্যান। বোঝা যাচ্ছে, পরিসংখ্যানের ওপরই বেশি করে জোর দিতে চাইছেন। শিরোনাম: নীরব স্ট্যাটিসটিক্স আমার হয়ে কথা বলে। সুব্রত কথায় কথায় বলেন, ফুটবলার হিসেবে ৫৩টা ট্রফি জিতেছি, কোচ হিসেবে ১৩টা। শুরুতে পরিসংখ্যানের পসরা সাজিয়ে যেন সেটাও বোঝাতে চাইলেন।

বইয়ের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বড় অবদান অবশ্যই সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্যর। সুচিন্তিতভাবেই হয়েছে বিষয় বিন্যাস। আর সাংবাদিক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে কলকাতার ফুটবল

আরও একবার ঋণী থেকে গেল। পিকে ব্যানার্জি, সুভাষ ভৌমিকের পর এবার দুই মলাটে সুব্রত ভট্টাচার্যর জীবনী যেভাবে তুলে আনলেন, কাজটা থেকে যাবে। বেশ কয়েক দশক ধরে নিয়মিত খেলার বই হাজির করে দীপ প্রকাশনও ময়দানের যথার্থ বন্ধুর কাজই করে চলেছে।

কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই বই, তাঁর জীবন নানা ঘটনা পরম্পরায় এতটাই বর্ণময় যে কল্পনার মিশেল দরকার নেই। একের পর এক গৌরবের মুকুট যেমন আছে, তেমনই পাল্লা দিয়ে এসেছে বিতর্ক। আর 'ঠোঁটকাটা' হিসেবে সুনাম বা দুর্নাম তো ছিলই। যে ঐতিহ্য তিনি আজও বহন করে চেলেছেন। তাঁর জীবনী যে 'বিস্ফোরক' মশলায় ঠাসা থাকবে, বলাই বাহুল্য। পঁচাত্তরে সেই পাঁচ গোলের ম্যাচে

স্টপারের নামও কিন্তু সুব্রত ভট্টাচার্য। এড়িয়ে যাননি, বেশ গুরুত্ব দিয়েই টেনে এনেছেন সেই ম্যাচের কথা। কতটা যন্ত্রণার কাঁটা হয়ে আজও বেঁধে, তা কয়েকটি লাইন থেকেই পরিষ্কার, ‘উমাশঙ্কর পালোধি সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছিল, পরের জন্মে যেন মোহনবাগান ফুটবলার হয়ে ইস্টবেঙ্গলকে ফাইভ-নিল হারাতে পারি। আমিও একটা শপথ নিচ্ছি এই আত্মজীবনীতে। যেদিন ইস্টবেঙ্গলকে ফাইভ-নিলে হারাবে মোহনবাগান, সেই টিমের ক্যাপ্টেনকে আমার বুটজোড়া দিয়ে দেব।.. মাঠে যদি বদলার সেলিব্রেশন হয়, তাহলে সেই সময় আমি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটলেও যাব। ৫-০র বদলা একমাত্র ৫-০।’

তাঁর শ্যামনগরের বাড়িতে সাতসকালে চুনী গোস্বামী হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও যেন তাড়া করে বিস্ময়। লিখেছেন, ‘আমি

সবসময় চুনী গোস্বামী নামের এভারেস্টকে ছুঁতে চেয়েছি। কিন্তু বাস্তবে শুশুনিয়া পাহাড়ও বোধ হয় নই।' একটি অধ্যায়ের শিরোনাম: ভালো প্রদীপদা, খারাপ প্রদীপদা। দু'রকম পিকে ব্যানার্জির ছবিই এঁকেছেন। উপসংহারে লিখেছেন, যে যাই বলুক, প্রদীপদার মতো কোচ ভারতীয় ফুটবলে আসেনি।

সুব্রত বলতেই উঠে আসে 'ঘরের ছেলে' শব্দ দুটো। শত প্রলোভনেও অন্য শিবিরে পা বাড়াননি। সেই গর্ববোধটা যেমন আছে, তেমনই প্রাপ্য স্বীকৃতি না পাওয়ার অভিমানও আছে ছত্রে ছত্রে। শেষবেলায় লিখছেন, 'আমার মুখটাই আমার শত্রু। পরের জন্মে ফুটবলার হলে মুখ বন্ধ রেখে খেলব। আর কোনও বিতর্কে থাকব না। হ্যাঁ, পরের জন্মেও মোহনবাগানেই খেলতে চাই।'

এই আত্মজীবনী একেবারে খেলোয়াড় সুব্রতর মতোই সোজাসাপটা। কোনও ডিপ্লোমেসি নেই। কাউকে তোয়াজ করার বা খুশি করার চেষ্টাও নেই। সবাইকেই দেখেছেন একেবারে নির্মোহ দৃষ্টিতে। কৃতজ্ঞতাতেও যেমন কার্পণ্য নেই, তেমনই কাকে ঘিরে কী খারাপ স্মৃতি, সেটাও বলতে বাকি রাখেননি। তিনি যেমন, তাঁর আত্মজীবনীও তেমন। নিজের কাছে এভাবে সৎ থাকতে কজন পারেন!

***

ষোলআনা বাবলু
সুব্রত ভট্টাচার্য
(সঙ্গে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়)
দীপ প্রকাশন

পরিচালকদের কাজটা সহজ করে দিল ‘নিয়তি’

বুক রিভিউ সাধারণত বই পড়ার পরেই লেখা হয়। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় থাকে, কিছু কিছু বই থাকে, যা পড়ার আগেই তার স্পন্দন অনুভব করা যায়। তেমনই একটি বই ‘নিয়তি।’ তাই বুক রিভিউ না বলে এই লেখাকে বুক প্রিভিউ–ও বলা যায়।

নামটা শুনে মনে হতেই পারে, কোনও ধর্মীয় বা ভৌতিক বিষয় নিয়ে বই। একেবারেই তা নয়। একেবারে সবুজ ঘাসের গন্ধ মাখা, খেলার মাঠের বই। ইডেনের একটি অভিষপ্ত দিন ও তার নানা উপাখ্যান। সময়ের দলিল

হয়ে ওঠা আস্ত এক উপন্যাস। মৃত্যুর কথা। আসলে, মৃত্যুকে ছাপিয়ে জীবনের কথা।

পরপর দু'বছর বইমেলায় দু'খানা বই। একটির বিষয় মোহনবাগান। অন্যটির ইস্টবেঙ্গল। দুটিতেই দারুণ সাড়া ফেলেছেন অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই দশক ধরে মূলস্রোত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। তারও আগে, বাবার হাত ধরে যুবভারতীতে ম্যাচ দেখতে আসা। কৈশোর থকেই মোহনবাগান শব্দটা যেন মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া। ময়দানের পরিচিত নামগুলো শুরু থেকেই মনের মধ্যে উঁকি দেওয়া।

সেই আবেগটাই টেনে এনেছিল ক্রীড়া সাংবাদিকতায়। প্রেসবক্সের ঠান্ডা ঘর ছেড়ে

মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যেতেন কোলাহল মুখর গ্যালারিতে। কখনও ঘুগনি বিক্রেতার সঙ্গে, কখনও লজেন্স মাসির সঙ্গে জুড়ে দিতেন গল্প।

কোন ছেলে বাবার চিতায় আগুন দিয়ে মাঠে চলে এসেছে, কে ডার্বি দেখবে বলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দিল, এই চরিত্রগুলোকে নিজের মতো করে চিনতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। তাই তাঁর দু'খানা বই নিছক তথ্যনির্ভর প্রবন্ধের বই নয়। ব্যাখ্যা

নির্ভর ইতিহাসও নয়। খেলোয়াড়দের গল্প, সমর্থকদের গল্প হয়ে উঠেছে। যে যাঁর মতো করে একাত্ম হয়েছেন।

এবার একটু সাহস করে আরও একটা বড় কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯৮০-র সেই ষোলই আগস্টকে নিয়ে লিখে ফেললেন আস্ত একটা উপন্যাস। এই উপন্যাস লেখার যোগ্য লোক আগে হয়ত অনেকেই ছিলেন। বিশেষ করে যাঁরা সেই সময় চুটিয়ে সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁদের পক্ষে কাজটা হয়ত কিছুটা সহজও হত। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তাঁরা সেই তাগিদ অনুভব করেননি। সেই জটিল কাজে হাত দিয়েছেন অর্ঘ্য।

সেই ঘটনা যখন ঘটে, তখন লেখকের বয়স

কত? এক বা দুই বছর। ফলে, ঘটনার তাৎক্ষণিক কোনও অভিঘাত থাকার কথা নয়। দেরিতে জন্ম হওয়াটা তো লেখকের দোষ হতে পারে না। বরং, তার দু'দশক পরে সাংবাদিকতায় এসেও যে সেই ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়, সেটা অর্ঘ্য বুঝিয়ে দিলেন। আসলে, এটা হঠাৎ করে লিখে ফেলা কোনও বই নয়। সলতে পাকানোর পর্বটা অন্তত দু'দশকের। কিশোর বেলা থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনেছেন। পরে সাংবাদিকতায় এসে বছরের পর বছর স্বজনহারানো পরিবারগুলোর সঙ্গে মিশেছেন। তাঁদের স্বজনহারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। যাঁরা সেদিন খেলেছিলেন, কালো পোশাক পরে যাঁরা রেফারির ভূমিকায় ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে দু'দশক

ধরে মিশেছেন। নিছক সেলফি তুলে দায় সারেননি। ‘এই সময়’ এ বাস করেও, সেই সময়ের নানা গল্প খুঁটিয়ে বের করেছেন। মরমী মনে তা অনুভব করেছেন।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মানুষ কেন খেলা দেখতে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন লাইন দিয়ে টিকিট কাটে। ঘোড়া–পুলিশের তেড়ে আসা দেখেও সে কীভাবে নির্ভিক হয়ে একটা টিকিটের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এইসব অনুভূতিগুলো সংবেদনশীল সাংবাদিক অর্ঘ্যর অচেনা নয়। বছরের পর বছর, এই অনুভূতিগুলোই উঠে আসে তাঁর নানা প্রতিবেদনে। সেলফি আর ফেবু ম্যানিয়ায় আক্রান্ত এই প্রজন্মের খুব কম সাংবাদিককেই এই অনুভূতিগুলো ছুঁয়ে যায়। অর্ঘ্যর একটা

সম্পদ যদি হয় ময়দানের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ, তাহলে অন্য সম্পদ হল নির্মেদ ও ঝরঝরে ভাষা। সেইসঙ্গে গুছিয়ে গল্প বলার মুন্সিয়ানা। একসঙ্গে এতরকম সম্পদ নিয়ে ময়দানে আর কেউ বিরাজ করছেন! সত্যিই জানা নেই।

হ্যাঁ, এমন একটা বিষয় নিয়ে উপন্যাসের মোড়কে একটা প্রামাণ্য দলিলের দরকার ছিল। এবং এই প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে অর্ঘ্যই সেই কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। আসল কথা, পড়া, পড়া এবং পড়া। যে অভ্যেসটা কমতে কমতে প্রায় লুপ্তই হতে বসেছে। অর্ঘ্যর মধ্যে পড়াও আছে, শোনাও আছে। তাই সুপর্ণকান্তির তৈরি গানও অনায়াসে প্রতিবেদনের বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

ষোল আগস্ট প্রতিবছরই আসে, যায়। কই, আর কারও মধ্যে তো এমন ভাবনা দেখি না। উপন্যাসে এই গানের কথা থাকবে! থাকারই কথা। সেই গানটাও তো সেই সময়েরই কথা বলে। নানা আঙ্গিক থেকে ঘটনাকে দেখা। নানা আঙ্গিক থেকে সেই ফুটবল অনুরাগকে ছুয়ে দেখা। আসলে, টাইম মেশিনে চড়ে সেই সময়টাকেও ছুয়ে দেখা। সঙ্গে কোথাও কোথাও সোনায় খাদ মেশানোর মতোই কল্পনার রঙ মেশানো। আসলে, ৪৩ বছর পর কোনও ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গেলে অনেক মিসিং লিঙ্ক থেকে যায়। সেগুলোকে জুড়তে কল্পনার এই মিশেলটাও জরুরি। নইলে তা আলুবিহীন বিরিয়ানির মতো বেমানান হয়ে যাবে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এই বইয়ে কোনও নায়ক থাবে না, কোনও ভিলেনও থাকবে না। থাকবে টুকরো টুকরো কিছু ছবি। আর সব ছবির কোলাজে ‘নিয়তি’ হয়ে উঠবে একটা বিরাট ক্যানভাস। ‘এগারো’ যদি সেলুলয়েডে ধরা দেয়, তাহলে ষোল আগস্ট বিষয় হবে না কেন? নতুন প্রজন্মের পরিচালকরা এখন থেকেই চোখ রাখুন। তাঁদের হয়ে গবেষণার কাজটা অর্ঘ্যই করে দিয়েছেন। তাঁরা শুধু দ্রুত ছবির সত্ত্ব কিনে ফেলুন। হ্যাঁ, বই বাজারে আসার আগেই।

***

নিয়তি

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরণ পাবলিশার্স

মাঝমাঠের প্রশান্তর মতোই সাবলীল

প্রথম খেলা লেকের মাঠে প্রথম ফুটবল
মান্না, পিকে, চুনীর ছবি বিরাট সম্বল।

কলকাতা ফুটবলের তিন কিংবদন্তির আত্মজীবনী লেখা হয়েছিল। শৈলেন মান্নার আত্মজীবনীর নাম মনে নেই। পিকের আত্মজীবনী ‘উইং থেকে গোল’। আর চুনীর আত্মজীবনী, ‘খেলতে খেলতে’। যতদূর মনে পড়ে, তিনটিই প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দমেলায়, ধারাবাহিকভাবে। লিখেছিলেন একজনই, অশোক দাশগুপ্ত।

তারপর এল খেলা পত্রিকা। পুজো সংখ্যায়

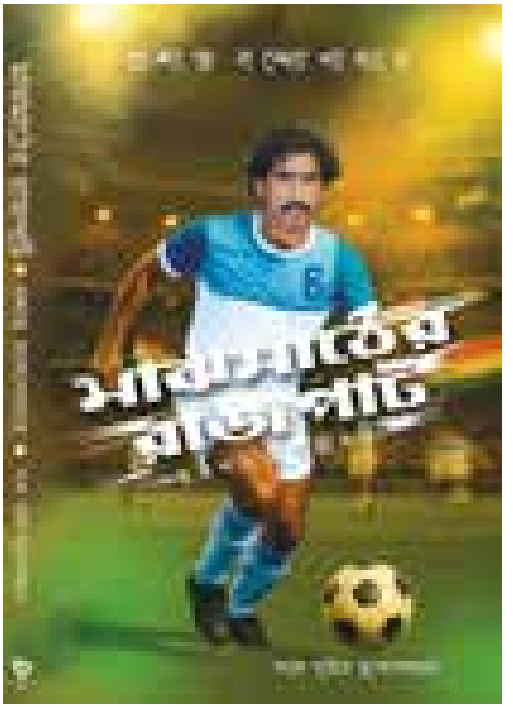

প্রতি বছরই কারও না কারও আত্মজীবনী। এমনকী সাপ্তাহিক খেলায় ধারাবাহিকভাবেও বেরিয়েছে তুলসীদাস বলরামের আত্মজীবনী। কিন্তু নয়ের দশক থেকেই যেন কিছুটা ভাটা পড়ল। ফুটবলাররা আর আত্মজীবনী লিখতে সেভাবে এগিয়ে এলেন না। সত্যিই কি তাঁরা লিখতে চাইতেন না? নাকি প্রকাশক পাওয়া যেত না? নাকি গুছিয়ে লিখবেন, এমন অনুলেখক পাওয়া যেত না?

গত চার-পাঁচ বছরে ছবিটা অনেকটাই বদলেছে। এগিয়ে এল দীপ প্রকাশন। প্রতি

বছরই কারও না কারও আত্মজীবনী। শুরু হয়েছিল পিকে ব্যানার্জিকে দিয়ে। তারপর সুভাষ ভৌমিক। তারপর সুব্রত ভট্টাচার্য। এবার প্রশান্ত ব্যানার্জি। চারটিই বাজারে আনল দীপ প্রকাশন। চারটির ক্ষেত্রেই অনুলেখক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। আনন্দবাজারের তিন দশকের অভিজ্ঞ সাংবাদিক সুপ্রিয় এতদিন কাজটা করতেন আড়াল থেকে। ফলে সেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে পড়েননি। এই চারটি জীবনী যেন তাঁর কেরিয়ারে অন্য একটা মাত্রা এনে দিল। যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি বিষয় বিন্যাস করেছেন, হারিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলোকে তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই তারিফযোগ্য।

সুভাষ ভৌমিক বা সুব্রত ভট্টাচার্যর ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। হয়তো

‘বিস্ফোরক’ তকমা দেওয়াই যায়। কিন্তু প্রশান্ত ব্যানার্জির খেলোয়াড়জীবনের ভাবমূর্তি একেবারেই অন্যরকম। ঠান্ডা মাথার পরিচ্ছন্ন ফুটবলের মতোই মাঠের বাইরেও বিতর্ক থেকে যতটা সম্ভব দূরেই থাকতেন। তাঁর জীবনে বিতর্কের বিরাট কোনও উপাদান নেই। সবার সঙ্গেই সদ্ভাব রাখতেন। কারও সঙ্গে গায়ে গা পেড়ে ঝগড়া করতেন না। আত্মজীবনীতেও সেই প্রশান্তকেই তুলে ধরেছেন অনুলেখক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। কারও প্রতি কৃতজ্ঞতায় কার্পণ্য রাখেননি। উৎসর্গ করেছেন ছোটবেলার কোচ প্রয়াত বাবু গুহকে। এর থেকেই বোঝা যায়, তিনি আর যাই হোক, অকৃতজ্ঞ নন। সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, গৌতম সরকারদের প্রতি ঝরে পড়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। দুই কোচ পিকে ব্যানার্জি, অমল দত্তর মূল্যায়ন যেমন আছে, তেমনই জাতীয় কোচ চিরিচ

মিলোভানের জন্য ব্যয় করেছেন আস্ত একটা চ্যাপ্টার। তিনি অন্তত কর্তাদের শ্রেণিশত্রু মনে করেননি। তিনি কর্তাদের সম্পর্কে বেশ শ্রদ্ধাশীল, সেটা বারেবারেই ধরা পড়েছে।

সবমিলিয়ে এই আত্মজীবনী সাতের দশক ও আটের দশকের কলকাতার ফুটবলের আবহকে অনেকটাই চিনিয়ে দেবে। একজনের জীবনী মানে তো শুধু তাঁর কথা নয়। তাঁর সমকাল, তাঁর সতীর্থ, তাঁর চারপাশে থাকা নানা চরিত্রকেও চিনিয়ে দেয়। সেখানেই এই বইয়ের সার্থকতা। অহেতুক চাঞ্চল্য তৈরির ঝোঁক নেই। প্রশান্তর খেলোয়াড় জীবনের মতোই মসৃণ গতিতে এগিয়েছে। এমনিতেই ফুটবলের প্রতি নেট দুনিয়া ততটা সচল নয়। পুরনো কোনও তথ্য বা ঘটনা যাচাই করার চটজলদি উপায়ও নেই। যেসব বইয়ে আছে,

সেগুলিও বেশ দুষ্প্রাপ্য। এরকম আরও বই লেখা দরকার। যাতে বাংলার ফুটবলের ইতিহাস ও উন্মাদনা ধরা থাকবে। নানা ঘটনা, নানা ব্যাখ্যাও থাকবে। অনেক কিছু জানা গেল। আরও জানার খিদেকে উস্কেও দিল এই বই।

***

মাঝমাঠের রাজপাট
প্রশান্ত ব্যানার্জি
সহ লেখক: সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
দীপ প্রকাশন

আখড়া থেকে বইয়ের মলাটে

খেলোয়াড়দের আত্মজীবনী নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। একজন ক্রিকেটারের আত্মজীবনী বেরিয়েছে। একসময়ের সতীর্থ এক ক্রিকেটার জানতে চাইলেন, ‘তোর তো বই বেরিয়েছে। বেশ ভালই হয়েছে। একটা কথা বলবি, কে লিখে দিল?’

যাঁর বই বেরিয়েছে, তিনিও কম রসিক নন। তিনিও পাল্টা গুগলি ছুড়ে দিলেন, ‘আমার পক্ষে যে এতবড় বই লেখা সম্ভব নয়, এটা সবাই জানে। কে লিখেছে, তার নামটা তোকে বলতেই পারি। কিন্তু তার আগে তোকে বলতে হবে, বইটা তোকে কে পড়ে শোনাল। কারণ,

আমি জানি এটা পড়া তোর কম্ম নয়।’

খেলোয়াড়দের কাজ খেলা। তিনি গুছিয়ে লিখতে পারবেন, এমনটা না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই? তাঁর ছেলেবেলা, তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর লড়াই— এগুলোর মূল্য নেই? তাই তাঁর জীবনের কথা যদি অন্য কেউ লিখেও দেন, এতে অন্যায়ের কিছু নেই। এবং এটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকারও কথা নয়।

সাক্ষী মালিকের সেই কুণ্ঠা নেই। তিনি অকপটেই জানিয়েছেন, কে তাঁর হয়ে বইটি লিখে দিয়েছেন। এবং একেবারে প্রচ্ছদেই রয়েছে সেই সহ লেখকের নাম। বইয়ের নাম ‘উইটনেস’। নামটির মধ্যে আলাদা এক ব্যঞ্জনা আছে। উইটনেস মানে সাক্ষী। অর্থাৎ,

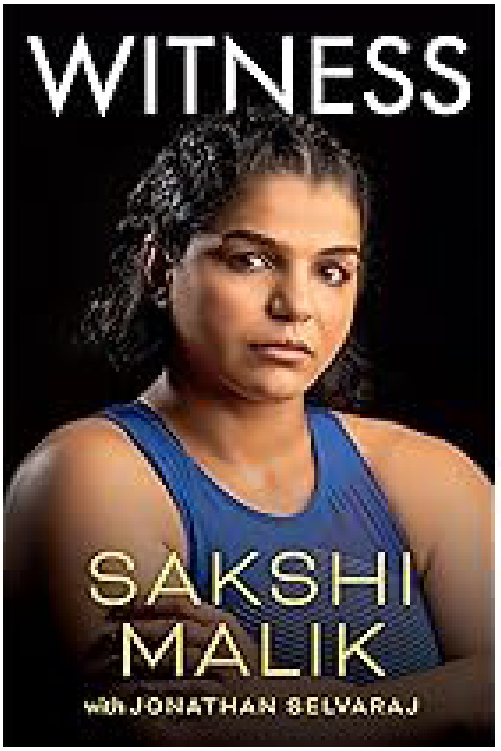

একদিকে এটা যেমন সাক্ষী মালিকের অনুমোদিত আত্মজীবনী, কিন্তু বইয়ের প্রচ্ছদে নিজের নাম ব্যবহার করেননি। আবার সাক্ষী অনেক ঘটনার সাক্ষী। সেই ভাষ্য এক সমকালীন ইতিহাসকে আরও কিছুটা চিনিয়ে দিয়ে যায়।

একজন মহিলা কুস্তিকে বেছে নিচ্ছেন, আজকের দিনে এটা ভাবা কিছুটা সহজ হলেও সাক্ষী যখন বেড়ে উঠছেন, তখন ততখানি সহজ ছিল না। পুরুষশাসিত সমাজের নানা ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে কুস্তির আখড়ায়

যাওয়ার চ্যালেঞ্জটা নিতে হয়েছে সেদিনের কিশোরীকে। একের পর এক বাধা টপকে কিনা পৌঁছে গেলেন অলিম্পিক পোডিয়ামে। তার আগে সুশীল কুমার বা যোগেশ্বর দত্তরা অলিম্পিকের আসর থেকে পদক এনেছেন ঠিকই, কিন্তু মেয়েদের কুস্তিতে সেই ইতিহাস নির্মাণ করেছিলেন সাক্ষীই।

সতীর্থদের যেমন কাছ থেকে দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন কর্তাদেরও। কুস্তি জগতের আলো আঁধারি দিক তাঁর মতো করে দেখেছেন। অকপটে সেসব কথা লিখেওছেন। ব্রিজভূষণ শরণ সিং মানুষটি আসলে কেমন, কেন খেলোয়াড়রা একযোগে তাঁর অপসারণ চাইছিলেন, সেসব কথা বিরাট অংশজুড়ে আছে। নিজে কীভাবে ব্রিজভূষণের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, সে কথা লিখতেও কোনও

কুণ্ঠা দেখাননি। এমনকী কৈশোরে আত্মীয়দের দ্বারাও যে এমন ছোটখাটো লাঞ্ছনা জুটেছে, সেকথাও অকপটেই লিখেছেন।

কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্নার কথা তো আছেই। সেই ধর্না থেকে নিজের পদক যেমন নদীতে ভাসাতে গিয়েছিলেন, তেমনই অকালেই অবসরও ঘোষণা করেন। কেন মাঝপথে থমকে গেল আন্দোলন, ভেতরে ভেতরে কারা অন্য অঙ্ক কষছিলেন, সেই প্রসঙ্গও উঠে এসেছে গভীর আক্ষেপের সঙ্গে। যেমন ববিতা ফোগাট সম্পর্কে খোলাখুলিই লিখেছেন, ‘আমাদের আন্দোলনের জন্য উস্কে দিয়েছিল ববিতা। কিন্তু নিজে ধর্নায় বসল না। কারণ, ধর্নায় বসলে বিজেপি ওর ওপর চটে যেতে পারে। ও চেয়েছিল, আমরা আন্দোলন করে ব্রিজভূষণকে সরিয়ে দেব। আর সেই

ফাঁকা চেয়ারে ও বসে পড়বে। আমাদের তাতেও আপত্তি ছিল না। ব্রিজভূষণের বদলে অন্তত একজন খেলোয়াড় তো বসবে।’

বিনেশ ফোগাট কেন ট্রায়াল ছাড়া অলিম্পিকে গেলেন, তা নিয়ে আক্ষেপ যেমন আছে, তেমনই সেই বিনেশ যে ফাইনালে পৌঁছেছেন, সেই গর্ববোধও আছে। একশো গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় বিনেশের ছিটকে যাওয়ায় আক্ষেপ আছে, কিন্তু তিনি অন্তত এর পেছনে কোনও চক্রান্ত দেখছেন না, এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ও উঠে এসেছে। যেমন, তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গ। একসময় তাঁদের সম্পর্কে পরিবারের কোনও আপত্তি ছিল না। হঠাৎ, সাক্ষী অলিম্পিক পদক পেতেই পরিবারের অনেকে বেঁকে বসলেন। তাঁরা আরও ভাল পাত্র খুঁজতে লাগলেন। এখানেও বেঁকে

বসলেন সাক্ষী, বিয়ে করলে তাকেই করব। অন্য কাউকে নয়।

এমন অনেক অজানা ঘটনা। যা খেলার মাঠের আড়ালে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাকে চিনিয়ে দিয়ে যায়। সাক্ষীর পথ চলার পাশাপাশি সেই সময় ও সতীর্থদেরও চেনা যায়। এই দেশে কুস্তির বিবর্তনের ইতিহাসটাও কোথাও একটা ধরা পড়ে। তাই কে লিখে দিলেন, বা কে পড়ে দিলেন, এই বিতর্ক থাক। এই জাতীয় বই আরও লেখা হোক। এই বইগুলোই তো দলিল হয়ে থেকে যাবে।

***

উইটনেস
সাক্ষী মালিক

BOOK
BOOK
BOOK
BOOK